একটি লড়াইয়ের ব্যবচ্ছেদ

ত্রিদিব সেনগুপ্ত

উর্মি

কেন যে চটিটা ঝোপের মধ্যে রাখল তা নিজেই জানে না উর্মি। এই যে ও কাউকে না-বলে, একা একা চলেছে জঙ্গলের, পাহাড়ের দিকে, এটার মধ্যে যে য়্যাডভেঞ্চার সেটা যেন আরো নিখুঁত হয়ে উঠল খালি পায়ের কল্যাণে। এখনও সূর্য পাহাড় ছাড়িয়ে ওঠেনি। কটা আর বাজে, সাতটা। বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা চারদিকটা। একটা ভয়-ভয় মজা লাগে উর্মির। অন্যদিন মা এতক্ষণে তাকে ঘুম থেকে তুলে দেয়। আজ সে নিজেই উঠেছে। মা-বাবা এখনো ঘুমোচ্ছে। অথবা, হয়তো, এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠে ফের কাল রাতের মত দুজনে মিলে মদ খেতে বসেছে। বেরোনোর আগে দিদিকে দেখেছে হাতে একটা চকচকে কাগজের মলাটে ইংরিজি বই নিয়ে প্রথমে বারান্দায়, তার পরে বাংলোর পিছনে গাছের গোড়ায় বসে থাকতে। যাক গে। মরুক গে। হাঁটতে খুব ভাল লাগে উর্মির। এইখানে বেড়াতে আসার দিন থেকে যতবার গাড়িতে উঠেছে সে, প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে, হাঁটতে পারলে অনেক ভাল হত। ছোট ছোট লাল সুরকির মত নুড়ি আর রাস্তার পাশের ঘাসঝোপের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে। কিন্তু সুযোগই পায়নি। মা আর দিদি একদম হাঁটতে পারে না। গুটিয়ে নেওয়া জিনসের ভাঁজে আর পায়ের পাতায় গোড়ালিতে ধুলোটা দেখতে খুব মজা লাগে উর্মির।

একটু একটু করে জঙ্গল শুরু হচ্ছে। একটা শিকল রাস্তার আড়াআড়ি লোহার খোঁটায় টাঙানো। ইচ্ছে হলে পাশ ঘুরেও যাওয়া যায়। লাফ দিয়ে পেরোলো উর্মি। পার হতে গিয়েই চোখে পড়ল সাদা আর বাদামি রঙের কুকুরটাকে। কুকুরটাকে গত দু-তিন দিনে বহু বার দেখেছে উর্মি। বিস্কুটও খাইয়েছে। একবার আদরও করতে গেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মা বলেছে সাবান দিয়ে হাত ধুতে। এখন কুকুরটাকে অনেকক্ষণ ধরে আদর করে। কেউ বারণ করার নেই। ভাবে, তার সঙ্গে যখন যাচ্ছে, কুকুরটার একটা নাম দেওয়া উচিত। ‘তোর নাম দিলাম স্নোয়ি। যদিও স্নোয়িকে তোর চেয়ে অনেক ভাল দেখতে।’

স্নোয়িকে পেয়ে একটু ভরসা হয় উর্মির। যেত সে ঠিকই। তবু একা একা পাহাড়ে জঙ্গলে যেতে তার একটু ভয় করছিল। এখন আর সে একা নয়। সে আর স্নোয়ি দুজনে মিলে পাহাড়ের মাথায় দূর্গ অব্দি যাবে। কালকের সেই অদ্ভুত লোকটা সন্ধ্যার পর বারান্দার সিঁড়িতে বসে তাকে দূর্গের গল্প করেছিল। লোকটার পরনে ছিল একটা খাকি ছেঁড়া ছেঁড়া হাফপ্যান্ট। আর কিচ্ছু না। লোকটা এই পাহাড়ের জঙ্গলে বাঘ আর বুনো হাতি আর ভাল্লুকের গল্প করেছিল। তখন থেকেই উর্মি মনে মনে ভেবেছে এই রকম একা একা যাওয়ার কথা। শুধু একটা ব্যাপারেই তার মন খারাপ লেগেছে। এই পাহাড়ে নাকি কোনো নদী নেই। নদী না-থাকলে য়্যাডভেঞ্চারকে য়্যাডভেঞ্চার বলেই মনে হয় না। একটা নদী থাকলে কী ভাল হত। যাকগে। কী আর করা যাবে।

জঙ্গল ক্রমশ ঘন হতে থাকে। দুপাশের গাছপালার ডালপাতাগুলো রাস্তার উপরে এগিয়ে এসে মাথার উপর একটা একটানা ঘন চাঁদোয়া তৈরি করে। এখন সূর্য উঠে গেছে যথেষ্ট উপরে। তবু ক্রমে মনে হতে থাকে সূর্যের তেজ যেন কমে যাচ্ছে। রঙও পাল্টাচ্ছে জঙ্গলের। আগে ছিল হালকা লাল আর সবুজ। ক্রমে ঘন-

সবুজ, খয়েরি-সবুজ, কাল-সবুজ হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দুপাশে বড় বড় গাছগুলোর মধ্যের জায়গায় আগে ঝোপগুলো ছিল হালকা আর ছোট। এখন সেগুলো মানুষ-প্রমাণ উঁচু, আর দেখলে মনে হয় যেন তাদের মধ্যে দিয়ে এক ইঞ্চিও এগোনো যাবে না। উর্মির প্রায় পাশে পাশেই হাঁটছে এখন স্নোয়ি। স্নোয়িরও ভাল লাগছে। কুকুরদের হাঁটার সময় পা-ফেলা আর ঘাড় নাড়ানো দেখেই বোঝা যায় তাদের ভাল লাগছে কিনা। মাঝে মাঝে স্নোয়ি উর্মিকে পিছনে ফেলে ঘোড়ার দৌড়ের মত লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। গিয়ে একটু মাটি শোঁকে। থমকে দাঁড়ায়। উর্মির জন্যে অপেক্ষা করে। তার পর আবার হাঁটে। উর্মি প্রথমে ভেবেছিল, স্নোয়ি তার পিছন পিছন এসেছে বিস্কুটের লোভে। কিন্তু এখন তো দেখছে এমনিতেই চলেছে। কেন যাচ্ছে কে জানে? কুকুর কি মানুষ হাঁটলেই তার সঙ্গে হাঁটে?

দুপাশের জঙ্গলে প্রচুর লতা। বাগানে লতা হলে মালি তা ছিড়ে দেয়। কিন্তু এখানে কেউ নেই ছিঁড়ে দেওয়ার। এমন ভাবে গাছ থেকে গাছে ছড়িয়ে রয়েছে যে মধ্যে দিয়ে বোধহয় মশাও যেতে পারবে না। কালকের সেই লোকটা যে সব জন্তুদের কথা বলেছিল তারা চলে কী করে এইসব লতায় আটকে না-গিয়ে, ভেবে অবাক লাগে উর্মির। হঠাৎ মনে হয়, যদি কোনো জন্তু লাফ দিয়ে তার গায়ে এসে পড়ে, তাহলে স্নোয়ি কী করবে?

‘কী রে স্নোয়ি, কামড়ে দিবি তো? নাকি, পাথরের আড়ালে গিয়ে কান উঁচু করে দেখবি, আমি বিলিয়নস অফ ব্লু ব্লিস্টারিং বার্নাকল্স বলে তাড়িয়ে দিচ্ছি কিনা?’

স্নোয়ি কোনো সাড়া দেয় না। রাস্তার গর্ত বাঁচিয়ে উর্মির পাশে পাশে দৌড়তে থাকে। রাস্তায় ক্রমশ খানা খন্দ গর্ত বাড়ছে। যদিও শুকনো। আর কী বাঁক। শুধু বাঁক না কোথাও কোথাও উপর দিকে উঠেছে। কোথাও আবার একটু নিচের দিকে নেমেছে। একটু ক্লান্ত লাগে উর্মির। অনেকক্ষণ হাঁটছে। কিন্তু থামতে ইচ্ছে করছে না। সামনে একটা বাঁক। উর্মি ঠিক করে ওটা পেরিয়েই বসবে একটু। গুনগুন করে গান গায় উর্মি। সিস্টার মিলড্রেড কী অদ্ভুত। কী অদ্ভুত অদ্ভুত গান শেখায়। রোমান্সের। মাদার সুপিরিয়র জানে না নিশ্চয়ই। কিন্তু, গাইতে খুব ভাল লাগে। এরকম একা একা। অল থিংস অফ এভরি কাইন্ড রিমাইন্ড মি অফ ইউ।

বাঁকটা পেরিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যায় উর্মি। তার সঙ্গে স্নোয়িও। সামনে একটা নদী। অথচ, সবাই জানে, সেই ভিখিরি গোছের লোকটাও বলেছিল, এই পাহাড়ে কোনো নদী নেই। নদীর ঝরঝর শব্দটায় কানে যেন তালা লেগে যাচ্ছে। অথচ, এতক্ষণ টেরই পায়নি।

যযাতি

ঘুম ভেঙে যায় যযাতির। অনির্বচনীয় এক মহিমায় পূর্ণ তার হৃদয়-মন। সচেতন থাকে যযাতি। যাতে তার ডান হাত বা ডান হাতের তর্জনীর একটুও স্থান পরিবর্তন না হয়। এই ভাবে সেই অমোঘ শক্তি সঠিক প্রচেষ্টায় রত যারা, সঠিক আগ্রহের সঙ্গে সাধনায় যারা চেষ্টিত, তাদের সাহায্য করে, ইঙ্গিত করে, দিক নির্দেশ করে দেয়। এখনকার পদ্ধতি খুব সহজ। তার টেবিলের ড্রয়ারে সদা-প্রতীক্ষাশীল মানচিত্র বার করে, তার থেকে মিলিয়ে নেওয়া, ওই দিকে, ওই পরিপ্রেক্ষিৎ কোন জায়গায় সম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এই পদ্ধতি জটিল। সঠিক সমাধান না-ও আসতে পারে। কিন্তু, তা নয়। প্রতি বারই এই ভাবে ইঙ্গিত পেয়েছে যযাতি। এবং গিয়ে, সঠিক ক্রিয়ার দ্বারা একটু একটু করে চরিতার্থতার, মোক্ষের নিকটে এসেছে।

ড্রয়ার খোলার আগে সাবধানে একবার চার দিকে দৃষ্টিপাত করে যযাতি। কেউ জেগে আছে কিনা। না, কেউ জেগে নেই। কেউ জেগে থাকে না এখানে। সারি সারি টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রত্যেকে একটা আরামের ঘুমে লিপ্ত। যাতে ঘুমের ব্যাঘাত না-হয়, সেই জন্য জানলার কাঁচে কাগজ লাগানো হয়েছে। তাতে ধুলো জমে জমে আলো আসা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া রয়েছে জানলার সামনে স্তূপাকৃতি ফাইল। প্রত্যেকটা নাগরিকের সম্পর্কে সরকারের জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য। আগেও তারা, যযাতিরা ঘুমোত। কিন্তু, মাঝে মাঝে অসুবিধা সৃষ্টি কোনো অতি-ব্যগ্র মানুষ। সরকারি অফিসের ক্রিয়াকর্মের নিরাপত্তার চৌহদ্দির ভিতর এই অফিসটা ভুক্ত হওয়ার পর থেকে সে বিঘ্নও চলে গিয়েছে। সবাই গভীর ঘুমে। একা যযাতি জেগে।

এই ভাবে প্রত্যেক বার সে সাহায্য পায়। সাহায্য পায় ক্রমশ তার নিরলস সাধনাকে সফল করে তুলবার। পাওয়া তার সঙ্গত। এই সাধনার জন্য কী সে করেনি। বিয়ে করেনি যযাতি। তার সন্তান স্ত্রী পরিবার তার সাধনায় ব্যাঘাত করতে পারত। আর, এক জন স্ত্রীর কাছ থেকে যা পাওয়া যায়, অনেক সুচারু ভাবে তা সে পায় ঝুমুরের কাছ থেকে। সেই ললিতকলাবিধিতে ঝুমুর অনেক বেশি পারদর্শী হয়ে উঠেছে তার জীবিকার প্রয়োজনে। যেমন হয়। একটা পেশাদারী দক্ষতা। একটা পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গী। তার পাড়ায় তার অফিসে কোনো সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশ না নিয়ে নিয়ে নিজের সাধনার জন্য সময় সংগ্রহ করেছে। তাতে কম বিদ্রূপের সম্মুখীন হয়নি যযাতি। সে সব সে সহ্য করেছে। সাধনোচিত স্থৈর্যে। আর, একটু একটু করে সে মোক্ষের কাছে পৌঁছেছে। যেখানে পৌঁছলে সব কিছু সমস্ত কিছু এসে যাবে তার মুঠোর মধ্যে। চার পাশের মানুষগুলো তখন মৃত্তিকার কীটের মত থাকবে তার পায়ের তলায়। সমস্ত বৈভব বিলাস সব ক্ষমতা সব কিছু তার হাতে।

আর দেরি করা ঠিক নয়। প্রতি মুহূর্তে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। পরিপ্রেক্ষিৎটাকে স্মরণে আনার জন্য যযাতিকে কোনো চেষ্টা করতে হয় না। যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে - দুপাশে জঙ্গল - ঘন জঙ্গল - মধ্যের পথটা দিয়ে একটি কিশোরী চলেছে। ক্ষিপ্র হাতে মানচিত্রের পাতা ওলটায় যযাতি।

দুর্গ

আজ সারা দিন খালি অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। প্রথম হল ওই নদীটা। সবাই জানে, ওখানে কোনো নদী নেই। তাহলে, এল কোত্থেকে? তার পরেও আরো আশ্চর্য কথা, নদীটা পার হওয়া। যা স্রোত। উর্মি ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যত কাছে যেতে লাগল, দেখল, একটা করে পাথর যেন গজিয়ে উঠছে জলের মধ্যে। দূর থেকে একটুও দেখা যায়নি। কিন্তু, কাছে এসে দেখল, প্রায় একটানা একটা ব্রিজ। জল গেছে সেই পাথরগুলোর নিচ দিয়ে। উর্মির মনে হল, যেন, মোজেসের মত ব্যাপার এটা। রেড সি দুভাগ হয়ে মধ্যে ডাঙা দিয়ে দিল তাকে। তবে এখানে হয়ত পাথরগুলো আগে থেকেই ছিল। দূর থেকে বোঝা যায়নি।

আর এখন উর্মির মনে হচ্ছে, তার ইচ্ছাপূরণ করার জন্যে কেউ বসে আছে এখানে। যেই তার মনে হচ্ছে, স্নোয়ি কোথায় গেল, অমনি লেজ নাড়তে নাড়তে কোনো একটা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে স্নোয়ি। এত বড় বড় ঘাস দেখে যেই সে ভাবল, বুঝি আর দুর্গের উপরে ওঠা হবে না, সঙ্গে সঙ্গে দেখল, সিঁড়িতে কোনো ঘাস নেই।

উর্মি আর স্নোয়ি দুজনে ঘুরে বেড়ায় দুর্গের মধ্যে। ইতস্তত। দুর্গের মধ্য অনেক ঘর। ঘরের মধ্যে মধ্যে ঘর। মেঝের ফাটল থেকে দেওয়াল থেকে আগাছা বেরিয়েছে। এক জায়গায় একটা বড় লম্বা পাথরের বেদি। উর্মির মনে হয়, এখানটায় রাজা বসত। রাজাকে যেন সে দেখতে পাচ্ছে। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, রানী। সবাই। সকালে না-বলে সে বেরিয়েছে। ফিরে গিয়ে প্রচুর বকুনি খেতে হবে। তবু সে এরকম করতে রাজি, এই রকম দুর্গে আসতে পারলে।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে যায় উর্মি আর স্নোয়ি। বিরাট ছাদ। তার চার দিকে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের এক এক জায়গায় ছোট ছোট অংশ কাটা। পিছনের দিকে চোখ পড়ে উর্মির। এক জায়গায় একটা খোলা দরজার মত অংশ। তার গোড়ার থেকে একটা শ্বেত পাথরের স্ল্যাব এগিয়ে গিয়েছে বাতাসে। উর্মির খুব ইচ্ছে করে ওই স্ল্যাবের উপরে গিয়ে দাঁড়াতে। আবার ভয়ও করে। যদি পড়ে যায় এত উপর থেকে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে উর্মি দুপাশের দেওয়াল আঁকড়ে স্ল্যাবের উপর গিয়ে দাঁড়ায়। এখান থেকে আরো তিনটে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। সবুজের মধ্যে যেন নীল পাহাড়গুলো। এখানটায় দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, যেন যে কোনো সময় দূর থেকে আসা ঘোড়সওয়ার সৈন্যদল দেখতে পাবে ও। তাদের হাতে লম্বা লম্বা বর্শা। মুখ ঢাকা বর্মে। বর্শার গায়ে একটা পতাকা। তাতে একটা সিংহের ছবি আঁকা। তার পরই তার মনে হয়, তা কী করে হবে? সেটা তো সে ক্রুসেডের ছবিতে দেখেছে। রিচার্ড দি লায়নহার্ট। সেটা এখানে আসবে কী করে? তার পাশে, পা আর দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়ায় স্নোয়ি। উর্মি দেখতেই থাকে। এই খোলা দেওয়ালের ভিতরটা আর বাইরেটা কী ভীষণ আলাদা।

হঠাৎ স্নোয়ির দিকে নজর পড়ায় সচেতন হয় উর্মি। কান খাড়া করে ঠিক নিচে, দুর্গের বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে আছে স্নোয়ি। ভাল করে তাকিয়ে উর্মিও দেখতে পায়, একটা ছায়া। লোকটাকে দেখা যায় না। কিন্তু স্থির তার ছায়াটা। দরজার সামনের খোলা জায়গায়।

ত্রিদিব

ত্রিদিব ভয়ানক বেকার। এরকম উদ্যম যা সে এই মুহূর্তে নিজের ভিতর টের পাচ্ছে তার জীবনে আগে কখনো আসেনি। এমনিতে তার জীবনযাত্রা খুব সরল। সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার চেঁচামেচির পর সে ব্যাগ হাতে করে বাজারে যায়। বাজার থেকে পয়সা মেরে সে সারা দিনের চা ও বিড়ির সংস্থান করে। বাড়ি ফেরার পথে, রতনদার দোকানে চা খায়। খেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে, হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি আসে। এসে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে দুপুরের খাবার খায়। খেয়ে উঠে একটা বিড়ি। তার পর দুপুরের ঘুম। ঘুম থেকে উঠে ফের রতনের দোকানের চা। বিড়ি। আড্ডা। তারপর, বাড়ি ফিরে চাকরির দরখাস্ত লেখা। তারপর রাত্তিরের খাওয়া। তারপর ফের ঘুম। আর ঘুম মানেই স্বপ্ন। হ্যাঁ। স্বপ্ন। এই স্বপ্নই তাকে আজ এই উদ্যম দিয়েছে।

এত দিন ধরে, রোজ ঘন্টার পর ঘন্টা স্বপ্ন দেখছে ত্রিদিব। সেই প্রত্যেকটা স্বপ্ন একটা লোককে নিয়ে। লোকটা প্রতিদিন দিনের পর দিন নানা জায়গায় নানা সময়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সেই বীভৎস কাজটা করে চলেছে। প্রত্যেকটা স্বপ্ন দেখে উঠে অসহায় উদ্বেলতার মধ্যে নিজের হাত কামড়েছে ত্রিদিব। সেই কিশোরী বাচ্চা মেয়েগুলোর মুখ তাকে তীব্র যন্ত্রণা দিয়েছে। কিন্তু, কী করবে সে? কী করে জানতে পারবে লোকটা কে,

কোথায় থাকে? অপরিচিত কোনো লোক দেখলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নজর করছে। সেই ঘৃণ্য মানুষটার সঙ্গে কোনো মিল নেই। কেন কর লোকটা ওরকম - তন্ত্রসাধনা? তন্ত্রসাধনা নিশ্চয়ই। কিন্তু কী জন্যে?

আজ, এত দিন পরে, আজকের স্বপ্নের জায়গাটাকে সে চিনতে পেরেছে। বেতলার অভয়ারণ্য। তাকে গিয়ে পৌঁছতেই হবে। যদি ততক্ষণে তার সেই বীভৎস ব্যাপারটা হয়ে গিয়ে থাকে, তবে, ঘটনার সূত্র ধরে ও এগোবে। খুন করে ফেলবে লোকটাকে। করবেই। কিছুই করে না সে। একটা কিছু করা খুব দরকার। একটা খুন।

তুমুল ক্ষিপ্রতার ভিতর নিজের মধ্যে একটা নতুন ত্রিদিবকে জেগে উঠতে দেখে ত্রিদিব।

গল্প

ভাঙাচোরা পাথরে তৈরি পাহাড়ের গা বেয়ে সিঁড়িটায় বারবার পা ফসকে যায়। তবু বিদ্যুৎ বেগে ওঠে ত্রিদিব। তাকে পৌঁছতেই হবে। এইমাত্র সে দুর্গের মাথায় একটা চৌকো ফ্রেমের মধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থায় মেয়েটাকে দেখতে পেয়েছে। দেখা মাত্রই চিনতে পেরেছে। সেই লোকটার নবতম শিকার। স্বপ্নেও এই ভাবেই হয়েছিল। লোকটা এখন দুর্গের মধ্যে ঢুকেছে। এরপরই - । দাঁতে দাঁত বসে যায় ত্রিদিবের। শেষ কয়েকটা সিঁড়ি উন্মুখ অধৈর্যে আর হিংস্র দৃঢ়তায় ত্রিদিব প্রায় বন্য চিতার মত লাফ দিয়ে পার হয়। দুর্গের মধ্যে ঢোকে। আবার সিঁড়ি। হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়য় ত্রিদিব। তাকে পৌঁছতেই হবে। ছাদের দরজায় পৌঁছেই একই সঙ্গে সেই লোকটা আর মেয়েটাকে দেখতে পায়। মেয়েটা ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে ছাদের শেষ সীমায় দাঁড়িয়েছে। তার পিছনে আর নিচে আকাশ। মেয়েটার আর লোকটার মধ্যে এখন একটাই বাধা। একটা সাদা-বাদামি রঙের কুকুর। তার বিস্তৃত মুখের ধারালো দাঁতে, গুঁড়ি মেরে থাকা অবস্থানে আর চাপা গরর্ আওয়াজে একটা হিংস্রতা।

শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে একটা লাফ দিতে গিয়েও ত্রিদিব থমকে যায়। মেয়েটা চমকে গেলেই পড়ে যেতে পারে। তাহলেই ওই নয় দশ বছরের কোমল দেহটা একটা রক্তমাংসের অপরিচিত তাল।

শিকারী বাঘের মত নিঃশব্দ ক্রূর পদসঞ্চারে একটু একটু করে লোকটার দিকে এগোয় ত্রিদিব।

সহসা উর্মির দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছন ফিরে তাকায় যযাতি।

যযাতি এবং ত্রিদিব দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। সামনের এই লোকটাকে ত্রিদিব সারা জীবন প্রতিটা দিন দেখেছে। যখন সে আয়নার সামনে গেছে। যযাতিও তাই। উর্মিও বিস্মিত হয়ে পড়ে - এরা দুজন লোক না একই লোক?

বিজ্ঞাপন

আসলে এটা কোনো গল্প নয়। বিহার টুরিজমের একটা বিজ্ঞাপন। বেতলা অভয়ারণ্য আর ওই দুর্গটাকে নিয়ে। আপনারা যদি এটাকে নিয়ে গল্প হিসাবে অগ্রসর হতে চান, তা হলে, আপনাদের মূলত চারটে জায়গায় নজর রাখতে হবে :

(১) যযাতি কি শেষ অব্দি তার কাজটা করতে পেরেছিল? কী কাজ? তখন কুকুরটা কি তাকে পুরনো প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কামড়েছিল?

(২) ত্রিদিব কি যযাতিকে আটকাতে পেরেছিল? যদি পেরে থাকে, তবে, কার মত করে - সিলভেস্টার স্ট্যালোন না অমিতাভ বচ্চন, নাকি সম্পূর্ণ অন্য কেউ?

(৩) ত্রিদিব আর যযাতি দুজনে কি আদৌ আলাদা লোক?

(৪) যযাতি যদি সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে কাজটা করতে পেরে থাকে, তাহলে তাকে শেষ অব্দি পুলিশে ধরেছিল কি?

চতুর্থ প্রশ্নটাকে নিয়ে আপনাদের একটু বেশি সাবধানী হতে হবে, কারণ, মনে রাখবেন, এটা বিহার পুলিশ।

** 'বারোমাস', এপ্রিল, ১৯৮৮ **